Vol. 60 | No. 1-2 | 2025

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে রাজনৈতিক চেতনার স্বাতন্ত্র্য

Volume	60
Issue	1-2
Year	2025
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Kanij Fatema
Published online	August 21, 2025
DOI	10.62328/sp.v60i1-2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v60i1-2.5
Pages	73-89
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩১॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i1-2

DOI: 10.62328/sp.v60i1-2.5
প্রবন্ধ জমাদান: ১৫ এপ্রিল ২০২৫
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ মে ২০২৫
পৃষ্ঠা: ৭৩-৯০

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে রাজনৈতিক চেতনার স্বাতন্ত্র্য

কানিজ ফাতেমা
ইমেইল: kanijbarna@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

রাজনীতি বলতে বোঝায় ক্ষমতাদখল বা কর্তৃত্বলাভ। শ্রেণিদ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এ লড়াই বা ক্ষমতায়ন রাষ্ট্র কিংবা জনসমাজ এবং শাসক কিংবা শোষিত উভয় পক্ষ থেকেই হতে পারে; শাসকের আধিপত্য কায়েমের আকাঙ্ক্ষা থেকে, আবার শোষিতের মুক্তির উপায় হিসেবে। এখানে আধিপত্য ও মুক্তির সঙ্গে ক্ষমতার প্রসঙ্গটি নিবিড়ভাবে জড়িত। আধিপত্যকামী শাসককে রুখতে জনসমাজ গড়ে তোলা লেখকের রাজনৈতিক চেতনার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক চেতনার মানদণ্ডে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প বিচার্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরাজমান সংকট থেকে মুক্তি ও মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই ইলিয়াস সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের সমালোচনা করেন, শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন এবং নিম্নবর্গীয় জনসমাজের বিপত্তি বা অধস্তনতার রূপ চিত্রায়ণ করেন, যা তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। পাশাপাশি মার্কসীয় শ্রেণিচেতনা, নারীবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সমন্বয়ে ইলিয়াস প্রতিবাদ-প্রতিরোধের যে রূপকল্প নির্মাণ করেন, তা শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতির বিপরীতে জনসমাজ বা শোষিত শ্রেণির রাজনীতিকে উত্থাপন করে। ইলিয়াসের ছোটগল্পে এই বিকল্প রাজনৈতিক চেতনার স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য।

মূলশব্দ

ক্ষমতা-কাঠামো, রাজনীতি, বিকল্প বয়ান, মার্কসীয় শ্রেণিচেতনা, কৃষকের প্রতিরোধ, পুরুষ-আধিপত্য, নারীবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয় চৈতন্য।

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত উপেক্ষা করেও একজন সময়সচেতন শিল্পী রাজনৈতিক চেতনাকে মননে-সৃজনে ধারণ করেই শিল্পের পথে অগ্রগামী হন। ষাটের দশকের জটিল, সংক্ষুব্ধ ও পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পটভূমিতে আবির্ভূত গল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) ক্ষেত্রেও বক্তব্যটি সমান প্রাসঙ্গিক। তবে উপন্যাস রচনায় তাঁর প্রয়াস ভিন্ন। *চিলেকোঠার সেপাই*য়ের (১৯৮৬) মতো অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক উপন্যাস রচনার পরেও বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ফ্রেমকে সম্পূর্ণতা দানের প্রয়োজনে তিনি *খোয়াবনামা*র (১৯৯৬) মতো আরেকটি অসামান্য উপন্যাস সৃষ্টিতে ব্রতী হন। ইলিয়াসের উপন্যাসকে একপাশে রেখে তাঁর ছোটগল্পে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের মূল্যায়নে বলা যায়, রাজনৈতিক গল্প রচনায় মনোনিবেশ করা তাঁর অভীষ্ট ছিল না। তবে গল্প-সৃষ্টিতে পাকিস্তানি আধা-ঔপনিবেশিক শাসনের জটিল পটভূমিতে শোষণদীর্ণ বাস্তবের রূপ চিত্রায়ণ; স্বাধীনতা-উত্তর রাষ্ট্র, সমাজ ও অধস্তন জনমানুষের জীবনের জটিলগ্রন্থি উন্মোচন; মধ্যবিত্ত, জাতীয় শ্রেণি-চরিত্র ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সমালোচনা এবং সর্বোপরি দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথকতায় তাঁর গল্প রাজনৈতিক অনুষঙ্গকে ধারণ করেই রচিত হয়েছে। একইসঙ্গে তাঁর গল্পে সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সপ্রাণতায় শিল্পিত রূপ লাভ করে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক বয়ানের অভিমুখ পালটে দেয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইলিয়াসের গল্প-বীক্ষণে রাজনৈতিক অভিজ্ঞানসমূহ অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে বিকল্প বয়ানের অনেক বৈশেষিক লক্ষণ শনাক্ত করা যাবে।

রাজনীতি বলতে 'ক্ষমতা-কাঠামোর সম্পর্ক বোঝায়, যার মাধ্যমে একদল ব্যক্তি অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়' (Millete 1970: 23)। বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করে বলা যায়, এ অঞ্চলে ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের হাত বদল হয়েছে; কখনো শাসকবর্গ ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল, কখনো-বা জনগণ। উপনিবেশের চৌহদ্দির মধ্যেই যাঁর বেড়ে ওঠা, সেই ইলিয়াস যে শতভাগ রাজনৈতিক সময়ের মানুষ সেটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তিনি তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন জাতি বা সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব আর রাজনৈতিক কূটচালে একটি ভূখণ্ড দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়ায় দেশত্যাগী অনিকেত মানুষের ভোগান্তি-হাহাকার। পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে নতুনভাবে কোনো স্বাধীনতা নয়; বরং পূর্বতন শাসকগোষ্ঠীর ন্যায় নতুন করে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়, সরকারের উচ্চপদের অধিকার থেকে বাঙালিকে বঞ্চিত করা হয়।

বৈশ্বিক-দৈশিক রাজনৈতিক অঙ্গনের নানামুখী টানাপোড়েন ইলিয়াস প্রত্যক্ষ করেন। সেই সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুড়িতে জমা আছে ভাষা-আন্দোলন, গণবিক্ষোভ-গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসসহ নানা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ঘটনা, যা তাঁকে সজাগ ও রাজনীতি-সচেতন করে তোলে। সমকালীন এ সকল ঘটনাধারার উত্তাপ অনুভব করে ইলিয়াস তাঁর গল্পে প্রতিরোধী-বয়ান তৈরির প্রয়াস পান। ইলিয়াস জানেন, স্বার্থবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রে কায়েমি শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তি জেগে না উঠলে কিংবা সংঘবদ্ধভাবে মিলিত হতে না পারলে শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তি অসম্ভব। এই রাজনৈতিক অভীপ্সাকে আত্মস্থ করে ইলিয়াসের গল্পে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি ও প্রথাবদ্ধ ধারণার বিনির্মাণে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের রূপকল্প নির্মিত হয়; মার্কসীয় শ্রেণিচেতনা, নারীবাদ, মুক্তিযুদ্ধের

চেতনার সমন্বয়ে অধস্তন জনমানুষকে গল্পের কেন্দ্রে প্রতিস্থাপনে বিকল্প রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটে।

ষাটের দশকের শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬-২০২০), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৮-২০২১), জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (জ. ১৯৩৯), রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-২০১৯), আব্দুস শাকুর (১৯৪১-২০১৩), রশীদ হায়দার খান (১৯৪১-২০২০), আব্দুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০২) প্রমুখ গল্পকাররাও কেবল সাহিত্যিক অভিব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং তাদের গল্পেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক চেতনার সমন্বয়ে রাজনৈতিক প্রতিবাদ। তাদের গল্পসমূহে রাজনৈতিক চেতনার মাঝে একটি বিকল্প পথ দেখা যায়; যা কেবল রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শকেন্দ্রিক নয়। বরং মানবিকতা, আত্মপরিচয়, সামাজিক ন্যায়বিচার, লিঙ্গসমতা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল জাগরণ।

নব্য সামন্তচক্র ও কৃষক-জীবনের সংগ্রামী উপাখ্যান

ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আধা-ঔপনিবেশিক কায়েমি স্বার্থবাদী শাসক ও শোষকচক্র গ্রামাঞ্চলে নিজেদের অবস্থানকে শক্ত ভিত্তি দেওয়ার প্রয়োজনে সাধারণ কৃষক শ্রেণিকে বঞ্চিত করে নব্য সামন্তচক্র এবং মধ্যস্বত্বভোগী একটা বিশেষ ভূমিস্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। রাষ্ট্রীয়শক্তি কর্তৃক প্রদেয় সুযোগ-সুবিধার দরুন একদিকে গ্রামীণ জোতদার কিংবা ভূমিমালিকেরা ফুলে ফেঁপে ওঠে, অন্যদিকে গ্রামীণ কৃষক শ্রেণি উপেক্ষিত হয়, বঞ্চিত হয়। এর ফলে গ্রামীণ সমাজজীবনে শ্রেণিবৈষম্য তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে জমিদার-জোতদার ও কৃষকশ্রেণির মধ্যে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক গ্রথিত থাকে। 'শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্বের অধিকারী যে শ্রেণী, তার চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা, সক্রিয় ইতিহাসবোধের তুলনায় কৃষকচেতনা একান্তভাবেই খণ্ডিত, নির্জীব, পরাধীন' (পার্থ ২০১৮: ৪)। কিন্তু গ্রামসি কৃষকশ্রেণির চেতনার সীমাবদ্ধতা কিংবা পরনির্ভরতার মধ্যেও সম্ভাবনা দেখেন। যেহেতু যে কোনো উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কটি বিরোধাত্মক সেহেতু 'এই বিরুদ্ধতার জন্য কৃষকচেতনার বাস্তব প্রকাশ সময় সময় ইতিবাচক ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারে' (পার্থ ২০১৮: ৪)। ফলে কৃষক শ্রেণি শোষিত হয় এটা যেমন সত্য, সেই সঙ্গে শত বঞ্চনা-লাঞ্ছনার মধ্যেও কৃষকশক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায় না, এটাও তেমনি সত্য। আবার নিম্নবর্গকে নিষ্ক্রিয়, ভীরু বলে মনে হলেও 'একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়ই শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রাহ্য করে।' (পার্থ ২০১২: ৮) রাজনৈতিক এই বিরোধ বা প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই কেবল নিম্নবর্গের উত্থান ঘটে।

বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসের অনুসন্ধানে লক্ষণীয়, দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকের সংগ্রাম প্রতিটি শাসকের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে কাজ করে এসেছে। কৃষকদের এই সংগ্রামের সূচনার ধারাবাহিকতাকে রণেশ দাশগুপ্ত ব্যাখ্যা করেন এভাবে:

> পূর্ববাংলার ১৯৪৭ সালের পূর্বেকার বহু সংগ্রামের ঐতিহ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন। সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ পুঁজিবাদের সাবেক প্রতিভূ ব্রিটিশ

> ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করার সংগ্রামে পূর্ব বাংলার নির্যাতিত কৃষক সমাজ যে বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তা পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছে। (২০১৪: ৯০)

ফলে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর শতেক শোষণ-বঞ্চনার বিপরীতে বৈপ্লবিক গতিবেগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে দরিদ্র-ভূমিহীন চাষিই ছিল গ্রামাঞ্চলের মূল রাজনৈতিক শক্তি। শাসকগোষ্ঠীর অবদমন আর উপেক্ষার পথ ধরেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে কৃষক শ্রেণির প্রত্যাবর্তন ঘটে। ইলিয়াস রাষ্ট্র কর্তৃক উন্নয়নের ধারণাকে নগ্ন করে কৃষক সমাজের অধঃপতিত দশার উন্মোচন করেন। কখনো-বা কৃষক শ্রেণিকে সম্বল করে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের রূপকল্প তৈরি করেন। গ্রামীণ ভূস্বামী ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্তাশক্তি কর্তৃক প্রান্তিকায়িত কৃষকদের ওপর শোষণ-নিপীড়নের বাস্তব চিত্র রূপায়িত হয়েছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'পায়ের নিচে জল' ও 'দখল' গল্পে। নদী-ভাঙা উন্মূল মানুষেরা কীভাবে গ্রামীণ জোতদার শ্রেণি কর্তৃক শোষণের শিকার হয় তার চিত্র রূপায়িত হয় 'পায়ের নিচে জল' গল্পে। নদী-ভাঙা মানুষ কিসমত সাকিদার নদী ভাঙনে নিজেদের জোতজমি হারিয়ে অন্যের জমিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু গ্রামীণ জোতদার আলতাফ মৌলবির ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের কারণে বর্গাচাষিদের খেয়েপরে বেঁচে থাকাটাই দুরূহ হয়ে ওঠে। এই জোতদার শ্রেণির স্বরূপ নির্ণয় করে ফ্রাঞ্জ ফাঁনো বলেন:

> জাতীয় ভূমালিকদের আচরণও বাস্তবে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনুরূপ। ... বিভিন্ন চক্রান্তের অনুশীলনের মাধ্যমে তারা প্রাক্তন বসৎকারের দখলী খামারগুলো পুরোপুরি কব্জা করে নেয়। ফলে জেলাগুলোতে তাদের দখলকে আরো শক্তিশালী করে। (Fanon 1990: 124)

আলোচ্য গল্পে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, আতিকের মেজো ভাইয়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলতাফ মৌলবির শ্রেণিগত-অবস্থান স্পষ্ট হয়:

> গ্রামের সলভ্যান্ট আর এডুকেটেড হাফ-এডুকেটেডদের সঙ্গে ডিল করা সবচেয়ে টাফ। আনফরচুনেটলি অল অফ আওয়ার রিলেটিভ্স টু দিস সেকশন এ্যান্ড দে ফর্ম দি রুলিং এলিট। (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ২০৬)

আতিকের পিতা করিম সায়েবের যে জমিতে কিসমত সাকিদার তার ছেলেকে নিয়ে চাষ করে জীবিকানির্বাহ করে, সেই জমি ক্রয় করে এবং ওই জমি থেকে কিসমত সাকিদারকে উচ্ছেদ করার বন্দোবস্ত করে আলতাফ মৌলবি। 'এই জমির সঙ্গে লাগোয়া বিঘা পাঁচেক জমি আছে তার, এটা নিতে পারলে এক দাগে অনেকটা জমি হয়। এই নিয়ে আলতাফ মৌলবি ঢাকায় গিয়ে আতিকের মায়ের কাছে তদবির করেছে' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ২০৪)। এভাবে চাষকৃত জমি কুক্ষিগত করে আলতাফ মৌলবির মতো জোতদার শ্রেণি ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে এবং গ্রামীণ বর্গাচাষিদের একেবারে নিঃশেষ করে দেয়।

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার গজারিয়ায় পাট জাগনা ও মরিচা গ্রামে পাট কাটা, দেলুয়াবাড়িতে আউশ ধান কাটা ও হাঁসখালির ডাঙা জমিতে নিড়ানি দেওয়ার জন্য নদী-ভাঙনের লোকেরা কৃষান হিসাবে কাজ করতে চাইলেও তাদের কাজের কোনো বন্দোবস্ত করে না। নির্দিষ্ট কয়েকজন কৃষককেই কেবল জমি চাষাবাদের কাজে কিংবা ফসল তোলার ক্ষেত্রে বহাল রাখে। এভাবে জমি হারিয়ে, কাজ না পেয়ে নিঃশেষিত হওয়ার দরুন জোতদার ও ভূস্বামী

আলতাফ মৌলবির শোষণে কিসমত সাকিদারের মতো বর্গাচাষিদের শেষ পর্যন্ত ঠাঁই নিতে হয় বাঁধের ওপর। তিন বছর ধরে নদী-ভাঙনের মুখে এলাকাবাসী বাঁধ দিয়ে যে ভাঙন প্রতিরোধের চেষ্টা করছে সেই বাঁধের ওপর অসহায় নিরবলম্ব নদী-ভাঙা মানুষ বসতি গড়লে আলতাফ মৌলবি ক্ষুব্ধ হয়। তার মতো সুবিধাভোগী শ্রেণির কাছে এটিকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টির মতো বিষয় বলে মনে হয়। সাধারণ মানুষের সমস্যাকে উপেক্ষা করে সে রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার ভান করে বলে:

> এই যে বান্দের উপরে দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি বান্দ একবার ভাঙলে এক ঘড়ির মধ্যে থানা হাসপাতাল ইস্কুল ব্যামাক পয়মাল হয়া যাবো না?' আতিককে ভালো করে বোঝবার জন্য সে গতি একটু কমায়, 'গওরমেন্ট ডেভেলপমেন্টের জন্যে এতো টাকা ঢালবা নাগছে, ব্যামাক এ্যারা সান্দাবো নদীর প্যাটের মধ্যে।–অর্থের অপচয়! অর্থের অপচয়!' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১৯৮)

তাই বাঁধের ওপর বসতিকারদের সে চিহ্নিত করে 'জাহেল' হিসাবে। মূলত বাঁধ নিয়ে আলতাফ মৌলবির চিন্তা নয়, বরং বাঁধে আশ্রয় নিয়ে মানুষগুলো যে বেঁচে গেল এটাই তার ক্ষোভের কারণ। এই লোকগুলো দুঃসহ অবস্থায় থাকলেই তাদের ইচ্ছামত শোষণ করা সম্ভব, এটা আলতাফ মৌলবি ভালোই জানে। ইলিয়াস মনে করেন, এ সমস্ত ভূমিমালিক ও জোতদার শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া সাধারণ চাষিদের কল্যাণ হতে পারে না। আতিকের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পকার কৃষক পরিবারের ঐক্যবদ্ধতার বেশ কিছু ইঙ্গিত দেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

১. কিসমত সিকদারের এই ভাঙা গলার ডাকে তাদেরই জমির বর্গাচাষীর দল কি এসে পড়লো? (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ২০১)

২. কিসমতের বড়োছেলের স্ত্রী উঠানে বসেছিলো একা। এখন তার পাশে কিসমতের স্ত্রী। ওরা কি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে? (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ২১১)

কৃষক শ্রেণির ঐক্যবদ্ধতা বা তাদের প্রতিবাদ নিয়ে আশঙ্কা কেবল আতিকের নয়, আলতাফ মৌলবিও এ বিষয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। কারণ জমি নিয়ে বিবাদ করে 'গত কয়েক বছরে গ্রামে মেলা রক্ত বয়ে গেছে, ভদ্রলোকদের মান-ইজ্জত সব ধুয়ে মুছে সাফ' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ২০৩)। তাই এবার আলতাফ মৌলবির কূটচালে কিসমত আলীকে বোঝানোর দায়িত্ব আতিকদের ওপর বর্তায়। কিসমত সাকিদারের মতো প্রান্তীয় মানুষেরা শোষণের শিকার হলেও শোষক শ্রেণি এদের সম্মুখে দাঁড়াতে ভয় পায়। কিসমত সাকিদার যখন আতিকের বসার বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দেয় তখন:

> কিসমত আলীর দীর্ঘ নির্দেশ শেষ হওয়ার আগেই আতিকের মাংসপেশী ও শিরাউপশিরার গেরোগুলো খুলে যায় এবং এই লোকটিকে ভয় পাওয়ার লজ্জায় সে কাচুমাচু হয়। (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ২০২)

এখানে শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বয়ানকে লেখক ইঙ্গিতময় করে তোলেন। 'দখল' গল্পে ভূমিমালিকের বিরুদ্ধে গ্রামীণ কৃষকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি আর ইঙ্গিতে সীমাবদ্ধ নয়। সেখানে রয়েছে এর বাস্তবায়িত রূপ। 'পায়ের নিচে জল' গল্পের মতো একই প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও 'দখল' গল্পে সাধারণ কৃষকদের

যূথবদ্ধ ভূমিকা গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রা দেয় যা লেখকের রাজনৈতিক ভাবনাকে দ্যোতিত করে। 'দখল' গল্পে ইলিয়াস 'একদিকে শোষকের জোতজমি কেন্দ্রিক শোষণ দেখান। কিন্তু লেখক এও জানেন 'তৃণমূলে বস্তুভিত্তির শেকড় কতটা গভীর' (শান্তনু ১৯৯৮: ৬৬)। তাই শেকড়ের টানে 'যুগ যুগ ধরে টিকে থাকা শোষণ, বৈষম্যময় উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা, আধা সামন্ত ও আধা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষণকারী শহুরে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি গ্রাম্য জোতদার ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী আধা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ জনতার প্রতিরোধ' (জাফর ২০১২: ৮১) গড়ে তোলে। 'দখল' গল্পে ইতিহাসের সেই অমোঘ সত্যকে রূপায়িত করেন গল্পকার। গল্পে কাজী মোয়াজ্জেম হোসেন জোতদার শ্রেণির প্রতিভূ এবং ঔপনিবেশিক চেতনাধারী। নিজেদের স্বার্থেই এরা ঔপনিবেশিক প্রভুদের সমর্থন করে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনে নাখোশ হয়। পাকিস্তান আমলে নিজ বাড়িতে মুসলিম লীগের অফিস প্রতিষ্ঠা করে মোয়াজ্জেম হোসেন। স্বাধীন বাংলাদেশে এরাই আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কসূত্র রচনা করে নিজেদের ক্ষমতাকে কব্জায় রাখে। মোয়াজ্জেম হোসেনের মধ্যম পুত্র মোতাহের হোসেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারক হিসেবে সুবিধাবাদী ও উপনিবেশবাদের সকল নেতিবাচক উপাদানের ধারক। ক্ষমতাকে পুঁজি করে মোয়াজ্জেম হোসেন, মোতাহের হোসেন বংশপরম্পরায় গ্রামের মানুষকে শোষণ করে। এদের জমিতে জনমানুষ বিনা বেতনে বংশপরম্পরায় খাটতে বাধ্য হয়। এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও মোয়াজ্জেম হোসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র মোবারক হোসেন কমিউনিস্ট আদর্শের অনুসরণে শ্রেণিচ্যুত হতে সক্ষম হয়। গ্রামের 'কলু আর তেলি আর নিকিরি কিষাণপাটের' সাথে তার ওঠা-বসা। পাকিস্তানিদের শোষণের বিপক্ষে গ্রামে কৃষক-জোট গড়ে তোলে। প্রান্তিক মানুষের হৃত-অধিকার উদ্ধার করতে গিয়ে একটা পর্যায়ে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের গুলিতে রাজশাহী কারাগারে শহিদ হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও প্রান্তিক কৃষকদের ওপর জোতদার শ্রেণির শোষণের অবসান হয় না। ফলে সাধারণ কৃষক আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের সংগ্রামের ধারা অব্যাহত রাখে। জোতদার শ্রেণির যাবতীয় শোষণের বিরুদ্ধে কাঁঠালপোঁতা, শিববাটি, গুণাহার, তেলিহার গ্রামের সকল চাষা প্রতিবাদস্বরূপ মোয়াজ্জেম হোসেনের চিথুলিয়া বিলের পশ্চিম দিকের সকল ধান কেটে নিয়ে যায়। মোতাহের হোসেনেরও আক্ষেপ—'বাবা-এখন তো স্বাধীন দেশ, এখন জমিজমা নিয়ে কোনো খটকা বাধে তো স্বাধীন দেশের বিচার আছে। কোর্টে যাও, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাও। যে সবুজ ও লাল পতাকার জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিলো সেই পতাকাশোভিত কোর্টের প্রতি এত অবহেলা কেন?' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ২২১)। স্বাধীন বাংলার মাটিতে আইন-আদালত সাধারণ কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় সহায়ক হতে পারেনি। আইনের ওপর অনাস্থা থেকেই নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে তারা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। এ অপরাধে চাষাদের প্রতিহত করতে মোয়াজ্জেম হোসেন ও মোতাহের হোসেন একত্রে পরামর্শ করে রক্ষিবাহিনীর সাহায্য নিয়ে মানুষদের নির্মূল করার পরিকল্পনা আঁটে। অন্যদিকে রক্ষিবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে চাষারা তেলিহারের দিকে কয়েকটা রাইফেলের আওয়াজ করে ফোর্সকে মিসগাইড করে কাঁঠালপোঁতার দিকে এগিয়ে আসে। কৃষকদের এই বিপ্লবাত্মক কর্মসূচিতে শোষক শ্রেণিও ভীতসন্ত্রস্ত হয়। মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ি লক্ষ করে কৃষকেরা আক্রমণে প্রবৃত্ত হলে বিপন্ন মোয়াজ্জেম হোসেন পৌত্র ইকবালের নিকট প্রবল বাসনা প্রকাশ করে বলে, 'তোর বাপের পাশে যেন আমার কবর হয়।' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ২৩০)

এখানে আদর্শগত একাগ্রতার প্রশ্নটি বড় হয়ে ওঠে। মোয়াজ্জেম হোসেন আদর্শগত দিক থেকে মোবারকের বিরোধী। এক ধরনের বিরূপতা থেকে পৌত্র ইকবালকে সে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। যদিও এ বিষয়টি থাকে অন্তরে সংগুপ্ত। প্রকাশ্যে প্রথাগত আইনের কথা বলা হয়। যেমন, পিতার জীবিতাবস্থায় পুত্রের মৃত্যুর পর পৌত্রের সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে শরিয়তি বাধা তৈরি করে মোয়াজ্জেম হোসেন জানায়, 'বাবা বেঁচে থাকতে ছেলের মৃত্যু হলে মৃত পুত্রের ছেলেমেয়ে কিছুই পায় না' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ২১৪)। এ ছাড়া সম্পত্তি না দেয়ার ক্ষেত্রে ইকবালের পিতার নাস্তিক হওয়ার ওপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করে। তার স্বার্থান্বেষী মানসিকতায় কেবল জনপ্রিয়তার লোভে সে বড় ছেলের প্রতি মমতা দেখায় এবং তেইশ বছর ধরে শহিদ পুত্র মোবারকের কবরের পাশে সমাধিস্থ হওয়ার আয়োজন করে রাখে। অন্যদিকে ইকবাল আদর্শগতভাবে তার পিতার পক্ষে। তাই চাষিদের আক্রমণকালে সমস্ত দোদুল্যমানতা ও পলায়নপরতাকে ঘুচিয়ে পিতার কবরের পাশে দাদার সমাধিস্থ হওয়ার প্রবল বাসনাকে আঘাত করে নির্ভয়ে নিজেই কবরে শায়িত হয়। দাদা মোয়াজ্জেম হোসেনকে স্থান না দেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় জোতদার শ্রেণির শাসনকেন্দ্রের পতন চিহ্নিত হয়।

পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য ও অধস্তন নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা

ঐতিহাসিকভাবে নারীজাতি পুরুষের অবদমন ও অধস্তনতার শিকার। এ কারণে কেইট মিলেট তাঁর *Sexual Politics* (১৯৬৯) গ্রন্থে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে রাজনীতির সাথে তুলনা করেন, যেখানে শক্তির আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ক স্পষ্ট (Millette 1970: 24-25)। পুরুষতন্ত্র বা পুঁজিবাদী পিতৃতন্ত্রের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে নারীবাদ নিম্নবর্গীয় নারীর জীবনের সকল বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে তার উত্থান ঘটাতে চায়। এই কথা বিবেচনায় রেখে ইলিয়াসের 'অসুখ-বিসুখ' ও 'তারাবিবির মরদপোলা' গল্প দুটি নারীবাদী তত্ত্বের নিরিখে পাঠ করা সম্ভব। পুরুষতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বলয়ে নারীর শারীরিক অসুস্থতা ও যৌনতার বিষয়টি উপেক্ষিত হতে হতে কীভাবে মনোবিকারে রূপ নেয়, তা-ই গল্প দুটির বিবেচ্য বিষয়। তবে গল্প দুটির বিশেষত্ব পুরুষতন্ত্রকে আক্রমণ, অধস্তন নারীকে গল্পের কেন্দ্রে প্রতিস্থাপন ও নারীর স্বতন্ত্র জীবনজিজ্ঞাসার রূপায়ণে। গল্প দুটিতে উপস্থাপিত উভয় নারীই তাদের অস্তিত্বশীল সত্তার ওপর জোর দেয়। নারীর শতেক বঞ্চনার মধ্যেও তার স্বতন্ত্র জীবন-জিজ্ঞাসার রূপায়ণে ইলিয়াসের গল্পে রাজনৈতিক ভাবনা রূপ লাভ করে।

'অসুখ-বিসুখ' গল্প এক অবহলিত নারীর জীবন-গাথা। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আতমন্নেসার সাথে তার স্বামীর প্রতিতুলনায় আমাদের সমাজমানসে পুরুষের গুরুত্ব ও নারীর অবহেলিত হওয়ার বাস্তবতা প্রকাশ পায়। নারী-পুরুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় এমন একটি বদ্ধমূল ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, পুরুষই শ্রেষ্ঠ। তাই অবস্থানগতভাবে পুরুষ পেয়েছে উচ্চ মর্যাদা। আর নারী হয়েছে গৌণ। মর্যাদা হিসেবে পুরুষ উঁচুতে অবস্থান করায় অসুখ-বিসুখে সে যে গুরুত্ব পায়, নারী তা পায় না। আলোচ্য গল্পে আতমন্নেসার স্বামী কলেজিয়েট স্কুলের দপ্তরি। তার হাঁপানী রোগ ছিল। যে কোনো অসুখে সে নিজের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করে। রাতভর স্ত্রীর সেবা পায়। অন্যদিকে নারী হিসেবে আতমন্নেসার সমস্ত জীবন কেটেছে অযত্নে-অবহেলায়। মাতৃত্বকালে তার জন্য কোনো ডাক্তারের চিকিৎসা কিংবা ওষুধ-পথ্য জোটেনি। তার প্রসববেদনা কারও কাছে সমবেদনা জাগায়নি। সংসারের কর্তা হিসেবে আতমন্নেসার

স্বামী কেবল খোঁজ নিয়েছে ছেলে সন্তান হয়েছে, নাকি মেয়ে সন্তান হয়েছে। যখন শুনত পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে তখন:

> বিছানা থেকে উঠে বংশালের ওজিউল্লা মৌলবিকে ডেকে দিয়ে ফের বাইরে চলে যেতো। ভাঙা গলায় কাঁদো কাঁদো সুরে ওজিউল্লা মৌলবির আজান শেষ হতে না হতে সোবহানের বাপ ঠিক ফিরে এসেছে। তার দুই হাত জুড়ে কাঁঠাল-পাতা ও কাগজের ঠোঙায় লাড্ডু, নিমকপারা, বাকরখানি। এই পর্যন্তই। (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১২১)

এখানে বর্ণনাংশের মধ্যে কন্যা সন্তান হিসেবে নারীর উপেক্ষিত হওয়ার বিষয়টিও উঠে আসে। বস্তুত, আমাদের সামাজিক পরিস্থিতির কারণে পুরুষ ও নারী দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়। জন্ম থেকে আমৃত্যু নারী উপেক্ষিত হয়, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোলাগা-মন্দলাগার বিষয়টি কারও নজরে আসে না। আতমন্নেসার সন্তান প্রসবের পরও প্রয়োজন হয় না তার খোঁজ নেওয়ার। 'ওষুধ না দিক, চিকিৎসা না হোক,—কেবল তারই জন্যে কোনো একটা পথ্য যদি কোনোদিন আসতো!' (আখতারুজ্জামান, ২০০৭: ১২১)—এই আক্ষেপ তার মধ্যে মনোবেদনার সঞ্চার করে।

পিতৃতন্ত্রের প্রধান প্রতিষ্ঠান পরিবার বলেই সংসারের কর্তা-ব্যক্তিটিসহ সন্তানেরাও আতমন্নেসাকে অমর্যাদার চোখে দেখে। তার অসুস্থতার বিষয়টি সন্তানদের কাছেও কোনো গুরুত্ব পায় না। সব সময় মাকে তাদের সুস্থ মনে হয়। মতিবানু যেমনি স্তুতির সুরে বলে 'আম্মার শরীল মাশাল্লা খুব ভালো। আমরা কুনোদিন আম্মার জ্বর ভি হইতে দেহি নাই' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১২৪)। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই মায়ের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে কন্যারা একাত্ম হতে পারে না। কন্যা নুরুন্নেসা কিংবা মতিবানু দুজনেই 'বাপসোহাগী'। পিতার দিকেই তাদের খেয়াল ছিল। দুই মেয়েই পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। দুই মেয়েরই অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে হলেও তারা তাদের মায়ের খোঁজ রাখে না। সমাজ নারীকে এমনভাবেই দেখতে শেখায় যে, নারীর কাছেও নারীর কোনো মূল্য বা মর্যাদা থাকে না। নারীও পুরুষকে গুরুত্ব দিতে শেখে। এই অনাদর-অবহেলা এক সময় নারীকে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত করে তোলে। মনোবিকার থেকে আতমন্নেসা মেয়েদের প্রতি হিংসাত্মক হয়, ক্ষুব্ধ হয়। মেয়েদের হাসি-আনন্দও তার ভালো লাগে না। তার মনোবিকৃতির চূড়ান্ত রূপ স্পষ্ট হয় স্বামীর ঘরে মেয়েদের অবস্থান চিন্তা করে। নুরুন্নেসা তার স্বামীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। 'কিন্তু কম বয়সের বৌয়ের কাছে লোকটা ভাউরা হয়ে যায়নি' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১২২)। ভেবে খুশি হয় আতমন্নেসা। তার আরেক কন্যা মতিবানুর স্বামী সুরুজ মিয়া তার অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে এলে আতমন্নেসা হিংসাবোধ করে। ক্রোধে সন্তানের মৃত্যু কামনা করতেও দ্বিধা করে না। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত ক্রোধ ও হিংসা তার মনোবিকারের ফল।

আতমন্নেসার মনোবিকৃতির আরেক রূপ চিহ্নিত হয় ওষুধের প্রতি ব্যাকুলতায়। ওষুধ ও অসুস্থতা তার কাছে সমার্থক। অসুস্থতা মনোযোগ আকর্ষণ করে যা সে কখনোই পায়নি। ওষুধ তার কাছে বিবেচিত হয় মহার্ঘ্য বস্তু হিসেবে। বঞ্চনা ও অবহেলাজনিত হীনম্মন্যতাবোধ থেকেই তার মধ্যে সৃষ্টি হয় ওষুধের প্রতি এমন আকর্ষণ। ওষুধ সেবনের আকাঙ্ক্ষায় নিজের অসুস্থ মেয়ের ওষুধ খেয়ে নিজেও অসুস্থ হয়ে যায়। হাসপাতালে ডায়াগোনোসিসে তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। আতমন্নেসার গুরুতর অসুখে সে অখুশি না হয়ে বরং খুশি হয়। 'মেলা-দেখে-আসা ছোট মেয়ের মতো' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১৩০)। আনন্দে সে তার সমস্ত টেস্টের

বৃত্তান্ত জানায়। সকলের কাছে তার অসুস্থতা প্রমাণের মধ্য দিয়ে সে বিজয়ী হয়ে ওঠে। অসুস্থতার খবরে বাড়ির সকলের মন্থরতায় তার 'ঠোঁটের কোণে ছোট একটু গোলাপি মিষ্টি হাসি চিকচিক করে, যেন বাজি রেখে সে জিতে গেছে' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১৩০)। 'শরীর লোহার হোক কাঠের হোক—রোগ ব্যারাম ছাড়া কি মানুষ বাঁচে?' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১২০), অথচ এই সহজ সত্য কেউ বুঝতে পারেনি। এই বুঝে না ওঠার পেছনে ব্যক্তির অনাদর, অবহেলাকেই লেখক দায়ী করেন। এ পর্যবেক্ষণ বৈষম্যমূলক সমাজকাঠামোতে নারীর মুক্তির পরিসর গড়ে তোলে। পাশাপাশি আতমন্নেসার অসুস্থতাসূত্রে পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে লেখক নারীকে ব্যক্তি খোলসের ভেতর থেকে বের করে এনে তাকে প্রকৃত মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠা করেন, মানবিক বোধের উজ্জীবন ঘটান।

সতেরো শতকে বুর্জোয়া সমাজ 'যৌনতা' বিষয়ে এমন সব নিষেধাজ্ঞা জারি করে যে, সাহিত্যে এর সামান্যতম প্রক্ষেপণে তা 'কলঙ্কজনক সাহিত্য' বা 'Scandalous Literature' (Foucault 1998: 21) হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমান সময়েও মানুষের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। ইলিয়াসের সাহিত্যে যৌনতা বিষয়ক ধারণা বিশেষত নারীর যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ে গল্প রচনার প্রয়াস বুর্জোয়া মানসিকতাসহ পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের রাজনীতিতে যৌনতার অধ্যায়টিও পুরুষের নিয়ন্ত্রণে। নারীবাদী তাত্ত্বিক সিমোন দ্য বুভ্যোয়ার তাঁর *The Second Sex* (১৯৪৯) গ্রন্থে যেমনটি বলেন, পুরুষতন্ত্র নারীর যৌনজীবনকে আত্মসাৎ করে রাখে; 'Biological need—sexual desire and desire for posterity—which makes the male dependent on the female, has not liberated women socially. Master and slave are also linked by a reciprocal economic need that does not free the slave.' (Beauvoir 2011: 29) অন্যদিকে কেইট মিলেট যেমনটি বলেন: 'Sex is a status category with political implication.' (1970: 24) নারীকে এভাবে পুরুষের শাসন বা অধীন করার কারণে মিলেট এটিকে 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ' (1970: 25) বলে আখ্যায়িত করেন। যৌনতার অস্তিত্বের সাথে নারী-পুরুষ সমভাবে সংযুক্ত। ফ্রয়েড যেমনটি বলেন, 'সারসত্তায় লিবিডো অবিরত ও নিয়মিতভাবে পুরুষ, তা পুরুষের মধ্যেই দেখা যাক বা দেখা যাক নারীর মধ্যে' (বুভ্যোয়ার ২০১১: ৫৪)। কিন্তু প্রাচ্যে নারীর শরীরসহ তার যৌনজীবন নানা ধরনের কুসংস্কার আর নৈতিকতার মানদণ্ডে দেখা হয়। যৌন মিলনের ক্ষেত্রে পুরুষের যে একাধিপত্য বা স্বাধীনতা রয়েছে, নারীর ক্ষেত্রে তা বিপরীত-বাস্তব। 'নারীর যৌনতা পুরুষের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় বা নারীকে ভোগ্যবস্তু বিবেচনা করায় নারীর একান্ত যৌনানুভূতির কোনো মূল্য আর থাকে না' (সিরাজ ২০১০: ৪৭)। 'নিজের সার্বভৌমত্বের মধ্যে পুরুষ, আরো অনেক কিছুর সাথে, নিজেকে লিপ্ত করে কামলীলায়—সে সঙ্গম করতে থাকে দাসীর বা বারবনিতার সাথে বা করতে থাকে বহুবিবাহ।' (বুভ্যোয়ার ২০১২: ৬৪)

ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় সাহিত্যক্ষেত্রেও সেই নৈতিকতার মানদণ্ডে নারীর যৌনজীবন বা যৌনাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ বিঘ্নিত হয়। সাহিত্যে বরাবরই পুরুষের যৌনজীবন প্রাধান্য পায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে পুরুষের কাছে নারী যৌনতার দিক থেকে গ্রাহ্য হয়। আধুনিক কালে পৌঁছেও নারীর পক্ষে সে রকম একটি ভাষ্য নির্মাণ কঠিনই হয়ে যায়। নারীর যৌনাকাঙ্ক্ষা

বিবেচনা করে ইলিয়াসের 'তারা বিবির মরদ পোলা' গল্পটি হয়ে ওঠে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ এবং একইসঙ্গে তা নারীমুক্তির উৎস ও প্রেরণা সঞ্চারক। স্বামীর সঙ্গে বয়সের ব্যবধান ও বয়োবৃদ্ধজনিত রোগাক্রান্ত শয্যাশায়ী স্বামীর সংসারে তারা বিবির যৌনজীবনে অতৃপ্তি কখনো তাকে ক্ষুব্ধ করে, কখনো তার মনোজগতে বিকৃতি দানা বাঁধে। আলোচ্য গল্পে তারা বিবির অতৃপ্ত যৌন জীবনের কথা লেখক সরাসরি না বললেও কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য বা প্রসঙ্গের অবতারণায় তা উঠে আসে। ষাট বছর বয়সের রমজান আলীর সঙ্গে পঁচিশ বছর বয়সের তারা বিবির জীবনের একটা অংশ 'কান্না দিয়েই বিরতিময় ছিলো' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১৩৮)। আবার 'পঁচিশ বছরের ছেমড়িটারে লইয়া বুইড়ার বহুত মুসিবত' রমজান আলি প্রথম পক্ষের নাতিদের এ ধরনের রসিকতায় তারা বিবির অতৃপ্ত বাসনা প্রকাশ পায়। অসুস্থ অচল স্বামীর প্রতি তারাবিবির ক্ষোভের মধ্যেও রয়েছে তার অসুখী জীবনের ইঙ্গিত—'অ গোলজারের বাপ! এক্কেরে লাশটা হইয়া রইছো, না? আরে বুইড়ামরদ, খাটিয়ার লাশটা ভি লড়েচড়ে। তোমার লড়ন নাই? বিছানা জুইড়া ভ্যাটকাইয়া রইছো' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১৩৯)। এসব কথায় রমজান আলি বিরক্ত হয়ে রেগে ওঠে ঠিকই, কিন্তু তার আর কিছু করার থাকে না। অতৃপ্ত যৌনবাসনা তারা বিবির মধ্যে এমন মনোবিকৃতি ঘটায় যে, সন্তান নিয়েও তার চিন্তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। মা হয়েও একমাত্র পুত্র গোলজারের স্ত্রীর কাছে বিভিন্ন মেয়ের সাথে পুত্রের শারীরিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে পুত্রবধূকে সতর্ক করে। নারী হিসেবে সে পুত্রবধূর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং পুত্র সেখানে তার কাছে পুরুষ হিসেবে সন্দেহের পাত্র। সুতরাং পুত্রবধূকে পুত্রের চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন করার মধ্যে তার নারীসত্তাই জাগ্রত। আবার গোলজারের ঘরে গিয়ে কাজের মেয়ে দরজার খিল আঁটলে রমজান আলি ক্ষুব্ধ হয়। চিৎকার করে সে গোলজারকে ভর্ৎসনা করলে এ সময় তারা বিবি পুত্রের পক্ষ নিয়ে স্বামীর পুরুত্বহীনতাকে আঘাত করে অভিযোগের সুরে বলে 'গোলজারে কি করছে? পোলায় আমার জুয়ান মরদ না একখান? তুমি বুইড়া মড়াটা, হান্দাইয়া গেছো কব্বরের মইদ্যে, জুয়ান মরদের কাম তুমি বুঝবা ক্যামনে?' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১৪৭)। তারা বিবির এমন বক্তব্যে স্বামীর অক্ষমতা ও নিজের অতৃপ্ত বাসনার কথা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রমজান আলির শারীরিক অক্ষমতা ও তারা বিবির বাসনাবিদ্ধ হৃদয়ের প্রকাশ ঘটিয়ে ইলিয়াস নারীর চরিত্রায়ণে প্রথাগত ভঙ্গি থেকে সরে এসে এক ধরনের বিপ্লবাত্মক মনোভঙ্গির পরিচয় দেন। কেননা নারীর যৌনজীবন নিয়ে, তার যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ে অকপট ভঙ্গিতে গল্প রচনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। নারীর অবচেতনার এমন সচেতন প্রকাশ নারীর কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত করে তোলে। এক্ষেত্রে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নিঃসন্দেহে শিল্পের সংযমকে অক্ষুণ্ন রেখে ইঙ্গিত, সংকেত ও প্রতীকী পরিচর্যার সহায়তায় নারীর যৌনাকাঙ্ক্ষার সরব প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হন।

জাতীয় চৈতন্যের আত্মানুসন্ধান

ঔপনিবেশিকতার অবসান ও বাঙালির স্বাধীনতাকামী ও সংগ্রামশীল অস্তিত্বের আত্মপ্রকাশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ তাৎপর্যবহ ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করেছে। একটি দীর্ঘ সময় জুড়ে পরাধীনতার নিগড়ে বন্দি থেকে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশকে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত করে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলেও বিশ্ব-রাজনীতির কূটচালে ও রাষ্ট্রীয় শক্তির আধিপত্যের কারণে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল

দেশগুলো নব্য-ঔপনিবেশিকতার জালে জড়িয়ে যায়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালপর্ব। অভিজ্ঞতা ও সংবেদনার সংযোগী বাস্তবতায় ইলিয়াস মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দর্শনকে স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি ও জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে তাঁর গল্পের আখ্যান নির্মাণ করেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে তারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খেতাব ও স্বীকৃতি পায়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সমকালে এক শ্রেণির মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে যুদ্ধের ভয়াবহতার মুখে পরিস্থিতি-সঞ্জাত সাহসিকতা নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করে। এই শ্রেণির নাম আমাদের মূলধারার ইতিহাসে রয়ে গেছে দালিলিকভাবে অস্বীকৃত। অথচ সমকালে এটাও এক চরম সত্য। অবরুদ্ধ ও নিরস্ত্র জাতীয় চৈতন্যের আত্মানুসন্ধান, সত্তানুসন্ধানের জন্য সাহসিকতাই ছিল মুক্তির প্রথম সোপান। এ কারণে ইলিয়াস মুক্তিযুদ্ধকে অনেক বেশি ইতিবাচকভাবে দেখেন। সমকালের এই সত্যকে ইলিয়াস তাঁর সাহিত্যে রূপ দিতে বেশি আগ্রহী হন। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক প্রভুদের শাসন-ত্রাসন এবং এদের ভয়কে উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ কীভাবে সাহসের সঞ্জীবনী ধারায় পৌঁছে যায়, সে কথাই ইলিয়াস রাজনৈতিক চেতনার আশ্রয়ে 'অপঘাত' ও 'রেইনকোট' গল্পে রূপায়ণ করেন। একইসঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর সমাজকাঠামোতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উত্থানের বিপরীতে এই সাহসের পুনর্জাগরণে ইলিয়াস রচনা করেন 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্প।

'অপঘাত' গল্পে মুক্তিযোদ্ধা বুলুর মৃত্যু নিয়ে শঙ্কিত পিতা মোবারক আলি যেটাকে 'অপঘাত' বলে প্রচার করছিল, সেই মৃত্যুই এক পর্যায়ে তার কাছে ভিন্ন তাৎপর্য গ্রহণ করে। চেয়ারম্যানের পুত্র শাজাহানের মৃত্যু-পরবর্তী নানা জটিলতা প্রত্যক্ষ করে মোবারক আলির বোধের রূপান্তর ঘটে। শুরুতে মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে তার ধারণা ছিল স্থূল। বড় ছেলে বুলুর বিষয়ে তার উপলব্ধি ছিল—'বুলুটা বড্ডো বেশি বেড়ে গিয়েছিলো। মুক্তিবাহিনী করে তোরা করলিটা কী? মিলিটারি এসে গ্রামকে উজার করে দিচ্ছে, মরা ছাড়া তোরা আর কী বালটা ছিঁড়তে পারিস? (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ২৭২)। মিলিটারির ভয়ে তটস্থ মোবারক আলী পুত্রের মৃত্যুর বিষয়টিকে গোপন রাখতে নিজে ফিসফিস করে কথা বলে, স্ত্রী কাঁদলে তাকে ধমক দেয়। এমনকি 'মিলিটারির সঙ্গে কাল্পনিক বাক্য বিনিময়ের সংকল্পে তার বল তাই বাড়ে না' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ২৬৯)। কিন্তু শাজাহানের স্বাভাবিক মৃত্যুর পরেও নানা রকম ভোগান্তি প্রত্যক্ষ করে মোবারক আলির চৈতন্য জেগে ওঠে। সে উপনীত হয় ভীতিমুক্ত এক শুদ্ধ সত্তায়। পুত্রের মৃত্যু তার কাছে অপঘাত নয়, আত্মত্যাগ বলে গ্রাহ্য হয়; গৌরবের বিষয় হিসাবে বিবেচ্য হয়। নির্ভার সাহসী মোবারক আলি গ্রামের কবাজউদ্দিন, বিটলুর বাপ, ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সকলকে তার পুত্রের বীরত্বের কথা শোনায়। গ্রামে মিলিটারি ক্যাম্প পড়েছে বলে মোবারক আলি দেরি করে ফেরায় স্ত্রী উদ্বিগ্ন হলে সে বিরক্ত হয়। কারণ 'যার ছেলে মারা গেছে মাস দুয়েকও হয়নি, সেই মা অন্য কারণে উতলা হয় কিভাবে? সন্ধ্যার পর ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এরকম মরা মরতে গেল কোন দুঃখে' (এজাজ ২০১৬: ১৪)। চরিত্রের মধ্যে পুঞ্জীভূত এই ক্ষোভ ও সাহস ঔপনিবেশিকতাকে হটাতে এক মোক্ষম হাতিয়ার। এই সাহসিকতার সঞ্জীবনী ধারায় জীবনভীতু মোবারক আলি বুলুর মৃত্যুকে অপঘাত না বলে মহান মৃত্যুবরণ হিসেবে ঊর্ধ্বস্বরে ঘোষণা করে। লেখকের বর্ণনায়:

> না, বুকেই গুলি লাগলে বুলু গড়িয়ে পড়ে বৌডোবা খালে ...। তা এতোদিনে বৌডোবা খালে সে কি আর আছে? সে কি বসে থাকার ছেলে? বর্ষার ঢলে লাশ ঠিক পৌঁছে গেছে যমুনার স্রোতে। ... তো সেই স্রোতের ওপর সওয়ার হয়ে বুলু তার রওয়ানা দিয়েছে কোন দিকে? কোথায়? যমুনা গিয়ে মেশে কোথায়? পদ্মায়? নাকি মেঘনায়? তারপর আত্রাই পেরোতে হবে না? তারপর গুণাহারে কাপড়ের দোকানদারের বাড়ির পাশের নদী ধলেশ্বরী, সেটা কোথায়? মোবারক আলী সুরমা নদীর নাম জানে, কর্ণফুলির নাম জানে, করতোয়া তো তার চাচাতো বোন, স্কুলে তাদের ইতিহাসের মাস্টার ছিলো, বাড়ি তিতাস নদীর তীরে, কোথায় যেন ভৈরব, কোথায় শীতলক্ষ্যা—এত সব নদীর নাম মনে করতে করতে মোবারক হাবুডুবু খায়, থই পায় না। (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ২৮৯)

নদী এখানে অনিঃশেষ প্রবহমানতা বা চলমানতার প্রতীক যার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনাকে রূপকায়িত করেন গল্পকার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক বুলু মৃত্যুবরণ করলেও তার মৃত্যু যেন তাকে নিঃশেষ করতে পারেনি। পিতা মোবারক আলির মধ্যে সেই চেতনার সম্প্রসারণেই যেন বুলু অমর হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে মোবারক আলিও অস্তিত্বের সংকট বা নিরস্তিত্বের ভাবনা থেকে অনিঃশেষ সত্তায় উপনীত হয়, অস্তিত্বশীল হয়। একইভাবে 'রেইনকোট' গল্পে কলেজ শিক্ষক নুরুল হুদার মিলিটারির নিপীড়নের মুখে ভয়কে উপেক্ষা করে হঠাৎ সাহসী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ক্রিয়াশীল রাখেন গল্পকার। এক্ষেত্রে তার সহায়ক হয় শ্যালক মিন্টুর ব্যবহৃত রেইনকোট। রেইনকোটটি হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দ্যোতক। একদল 'মিসক্রিয়েন্ট' কলেজের দেয়াল ঘেঁষে বসানো ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দেওয়ায় পিওন ইসহাকের মাধ্যমে কলেজে প্রিন্সিপালের রুমে দেখা করার জরুরি খবর পায় নুরুল হুদা। নুরুল হুদা কলেজ শিক্ষক, কেমিস্ট্রির লেকচারার। ভীষণ ভীতু একজন মানুষ। মিলিটারির ভয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও যোদ্ধাদের নিয়ে কথা বলা কিংবা মিলিটারিদের অত্যাচার ঘটনা ইত্যাদি সকল বিষয়ে নিশ্চুপ থেকে সব সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে। 'রাস্তায় বেরুলে পাঁচ কলেমা সব সময় ঠোঁটের ওপর। কোনদিক থেকে কখন মিলিটারি ধরে' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ৩৯২)। প্রিন্সিপালের সালামের জবাবে সাড়া না দিলে কী ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে সেটা চিন্তা করে শ্যালক মিন্টুর ব্যবহৃত রেইনকোট গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে নুরুল হুদা। বৃষ্টির কারণে নুরুল হুদার স্ত্রী আসমা তার মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের রেখে যাওয়া রেইনকোট নুরুল হুদার গায়ে জড়িয়ে দেয়। রেইনকোট নুরুল হুদার মধ্যে এমন এক শক্তির সঞ্চার করে যে ভীতু নুরুল হুদা সাহসী মানুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানো মিলিটারি তার দিকে তাকালে নূরুল হুদা পরোয়া না করে তার চোখের ভোতা কিন্তু গরম চাউনিটাকে স্থির করে রাখে। কলেজে যাওয়ার পর মিলিটারিরা তাকে চোখ বেঁধে ধরে নিলেও নূরুল হুদা ভয় পায় না। মস্ত একটা ঘরে ঢুকিয়ে তার থেকে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করে। মিলিটারিদের যাবতীয় প্রশ্নের জবাবে 'মিসক্রিয়ান্ট'দের সাথে তার যোগাযোগের কোনো সূত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু কলেজে আলমারি সরবরাহকারী কুলিবেশী মুক্তিযোদ্ধাদের একজন তাদের গ্যাঙের সক্রিয় সদস্য হিসেবে নুরুল হুদার কথা বলেছে শুনে নুরুল হুদার চেতনার রূপান্তর ঘটে। সে গৌরব বোধ করে। 'মিসক্রিয়ন্টেদের ঠিকানা তার জানা আছে'—মিলিটারির এমন কথার জবাবে নুরুল হুদার উত্তর আসে, হ্যাঁ। কুলবেশী মুক্তিযোদ্ধাদের ঠিকানা না জানা সত্ত্বেও এই হ্যাঁ-সূচক উত্তরে সে স্বাধীনতার সপক্ষের এক বীর সেনানীতে পরিণত হয়। তাকে ঝুলিয়ে টর্চার করলে তার মনে হয় উৎপাত। মনে হয় যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের ওপর। রেইনকোট

খুলে নিলেও এক ধরনের উষ্ণতা অনুভব করে। একটি প্রতীকী বর্ণনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সম্প্রসারণকে তুলে ধরেন এভাবে:

> তার পাছায় চাবুকের বাড়ি পড়ে সপাৎ সপাৎ করে। তবে বাড়িগুলো বিরতিহীন পড়তে থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যে সেগুলো নুরুল হুদার কাছে মনে হয় স্রেফ উৎপাত বলে। মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টোর রেইনকোটের ওপর। রেইনকোটটা এরা খুলে ফেলেছে, কোথায় রাখল কে জানে। কিন্তু তার ওম তার শরীরে এখনো লেগেই রয়েছে। (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ৪০৪)।

যুদ্ধকালীন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর কারণে সব সময় তটস্থ থাকে নুরুল হুদা। তারই বাসা থেকে মিন্টু মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করায় ঢাকা শহরে সে চার বার বাসা বদল করে। অথচ বৃষ্টিস্নাত এক সকালে মিন্টুর ব্যবহৃত রেইনকোটের বরাতে তার চৈতন্যে জেগে ওঠে একজন মুক্তিযোদ্ধার সাহসী সত্তা। গ্যাঙের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে তার এই সংযোজনে সে উৎসাহ বোধ করে। শ্লাঘা বোধ করে এই ভেবে যে 'তার ওপর তাদের এত আস্থা?' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ৪০৪)। মিলিটারির অত্যাচারকে নির্বিবাদে গ্রহণ করে, স্রেফ উৎপাত বলে মেনে নিয়ে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধায় অভিষিক্ত হয়। এভাবেই লেখক মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সম্বল করে প্রতিকূলতার বিপরীতে সাফল্যকে চিহ্নিত করেন।

একইভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ক্রিয়াশীল রেখে লেখক মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিপরীতে প্রগতিমুখী শক্তির-সম্ভাবনার অভিমুখ রচনা করেন 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছোটগল্প হলেও যুদ্ধের পরের সময় এখানে গ্রথিত করায় গল্পটি ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। বিশেষত যুদ্ধোত্তর প্রজন্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তির পুনর্গঠনে রাজনৈতিক চেতনার স্বরূপ উন্মোচিত হয়। যুদ্ধকাল ও যুদ্ধ-পরবর্তী দুটো সময়কে ফ্লাশব্যাক পদ্ধতিতে তুলে ধরেছেন গল্পকার। স্বাধীনতা-উত্তরকালে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, স্বাধীন বাংলার মাটিতে '৭৫-উত্তর কালে নতুন শক্তির উত্থান ও মানুষের স্বপ্নভঙ্গের প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাচনে গল্পকার তুলে ধরেন। সেই সাথে সুবিধাবাদী শ্রেণির প্রতি ক্ষোভের উদ্‌গিরণ করেন গল্পকার এবং প্রতিরোধের বয়ানও উপস্থাপন করেন।

সাংগঠনিক তৎপরতার বাইরে ইলিয়াস যখন লেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার তীব্র সংরাগ এবং যুদ্ধাপরাধী-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তাঁর গল্পে প্রতিরোধের বয়ান উপস্থাপনের নেপথ্যে সক্রিয় থাকে। গল্পে লেখক সামনে অগ্রসর হওয়ার সামাজিক ভূমিকাকে নির্দেশ করেন। রথখোলার মোড়ে ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে পালানোর সময়ে মিলিটারির গুলিতে শহিদ হয় ইমামুদ্দিন। ইমামুদ্দিনের কিশোর ছেলে বুলেট পিতৃবন্ধু লালমিয়ার সঙ্গে হোটেলে কাজ করে। প্রৌঢ় লালমিয়া পেশায় হোটেলের ম্যানেজার। লালমিয়া তার বন্ধু-পুত্র বুলেটকে পায়ের পাতা যাদের উলটা দিকে তাদের স্বপ্ন দেখার বিষয়ে বললে বুলেট বলে, 'ঐ উল্টা ফিট করা পা-ওয়ালা মানুষ আপনারে আর কি কইবো? পায়ের ব্যারামের কথা কইলো?' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ৩৭১)। উলটা ফিট-করা পা-ওয়ালা মানুষগুলো পিছিয়ে-পড়া বর্গের অন্তর্গত। কথিত আছে ভূতের পায়ের পাতা পেছনের দিকে। পেছনে পাতা থাকলে সামনে এগোতে পারে না। প্রগতি মানে সামনে এগোনো। কিন্তু যাদের পায়ের পাতা পেছনের দিকে তারা পশ্চাৎপদতার বা প্রতিক্রিয়াশীল জীব। 'প্রচলিত বিশ্বাস যাকে ভক্তি-গদগদ চিত্তে দেখতে চায় তার বিপরীত, কিন্তু সমর্থ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি মুক্তিযুদ্ধ-

উত্তর প্রজন্মের। ফলে পেছনে ফেরাকে সে কোনোমতেই অগ্রগতি বলে ভাবতে পারে না, তাকে তার কাছে 'ব্যারাম'ই মনে হয়' (শান্তনু ১৯৯৮: ৫৯)। এই 'ব্যারাম' বা স্থবিরতা থেকে কোনোভাবেই যেন মুক্তি মিলছে না; যার রেশ যুদ্ধ-পরবর্তীকালে থেকে যায়। ফলে নতুন প্রজন্ম শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ইমামুদ্দিনের পুত্র বুলেটকে স্বপ্নের জাল বুনতে হয়।

মানুষ যে স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করেছিল, যুদ্ধ-পরবর্তীকালে সে স্বপ্ন অধরা থেকে ক্রমে জাল স্বপ্নে পরিণত হয়। নাজির আলীর মতো রাজাকার, স্বাধীনতাবিরোধী পুনর্বাসিত হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হয়। দেশ ও জাতির সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই অপশক্তির পুনরুত্থানকে একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখেন ইলিয়াস। তিনি মনে করেন এদের কারণেই বাংলাদেশ এখনো পিছনে পা ফেলে হাঁটছে। প্রতিক্রিয়াশীলতাকে ভয় করেছেন ইলিয়াস। এই প্রতিক্রিয়াশীলতাকে হটাতে এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালে যে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি তার সম্ভাবনাকে গাঁথতে লেখক স্বপ্ন-রূপককে আশ্রয় করে প্রতিরোধের রূপকল্প গড়ে তোলেন বুলেট চরিত্রের মধ্য দিয়ে। বলা বাহুল্য, বুলেটের জন্ম হয় ১৯৭১ সালে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে। বুলেট নামের পেছনে একটি ঘটনা রয়েছে। এই নামটি তার বাবার দেয়া। আকিকার সময় তার নাম রাখা হয়েছিল মোহাম্মদ কাসেম। জন্মের কয়েক দিনের মধ্যেই এই শিশু প্রসাব করে কয়েক হাত দূরে ঘুমিয়ে থাকা ইমামুদ্দিনের বুক ভিজিয়ে দেয়। এটা দেখে ইমামুদ্দিন বলে, 'প্যাসাব করে, মনে লয় বুলেট ছাড়তাছে' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ৩৬২)। এই ঘটনাকে উপজীব্য করে লেখক মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর চালচিত্র প্রতীকায়িত করেন। এই বুলেট 'একটি প্রজন্ম-প্রতীক অথচ স্বাধীনতা পরবর্তীতে স্বপ্নের জালে জালে, বৃদ্ধ লাল মিয়ার খোয়াব দিয়ে আক্রান্ত হয়ে, সঞ্চারিত হয়ে, একদিন ঠিক ঠিক বিছানায় প্রসাব করে দেয়, বড় বয়সেও' (মাসুদুল ১৯৯৮: ২৫৩)। লালমিয়া থেকে সংক্রামিত হলেও লালমিয়া ও বুলেটের স্বপ্নের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দুজনের চিন্তাই তাদের স্বপ্নের দৃশ্যপট পালটে দেয়। লালমিয়া স্বপ্নে দেখা লোকটির প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বুলেটের স্বপ্ন তাকে চিন্তিত করে। সে 'উল্টো পায়ের পাতা'র নিরাময় করতে চায়। স্বপ্নের মধ্যে বুজর্গদের উদ্দেশে বুলেটের তাই জিজ্ঞাসা:

> আচ্ছা হুজুররা, বহুত দিন তো হইয়া গেলো, আপনাগো পাগুলি মেরামত করেন না ক্যালায়?' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ৩৭৪)

স্বপ্নে লালচে মুখ, সাদা দাড়িওয়ালা নাজির আলির নেতৃত্বে 'উল্টানো পা-ওলার' পার্টিকে রুখতে বুলেট ছাদ থেকে হলুদ প্রসাবের ধারা বইয়ে দেয় নিচের দিকে। ঘুম ভেঙে বিছানা ভেজানোর কারণে লজ্জিত হলেও তার আফসোস হয় টার্গেট মিস করার কারণে। 'শিওরের বালিশ ঠিকমতো উল্টিয়ে নিলেও ডানদিক সম্পূর্ণ ভিজে যাওয়ায় বুলেটকে শুতে হয় বাঁ-পাশ ফিরে' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ৩৭৫)। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যে স্বপ্ন অধরা থেকে গেছে, তার বাস্তবায়নে বুলেটকে এবার শুতে হয় 'বাঁ-পাশ ফিরে'; টার্গেট মিস না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নতুন করে স্বপ্নের জাল বুননের প্রচেষ্টায়।

যে চেতনা নিয়ে এ দেশের মানুষ ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে; যুদ্ধ শেষে মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা ভূলুণ্ঠিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ব্যবহার করে তরুণদের একাংশের দেশপ্রেমহীন লুটপাটতন্ত্র কায়েমের ঘটনায়। এই বাস্তবতাকে ইলিয়াস তাঁর 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পে উপস্থাপন করেন। 'রেইনকোট' গল্পে ব্যবহৃত রেইনকোট

প্রতীকের ন্যায় 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পে স্টেনগান বা অস্ত্র হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দ্যোতক; স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে চেতনার বিনষ্টি ঘটে। উপনিবেশবিরোধী যে সংগ্রাম বা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়, সে যুদ্ধ বা সংগ্রাম ছিল অশুভর বিরুদ্ধে শুভ বা কল্যাণ চেতনার। স্বাধীন দেশে যখন আবার সেই অশুভ শক্তির উত্থান ঘটে, তখন সাময়িকভাবে আবার সুস্থ থাকা সম্ভব হয় না। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার নেশায় যুবক শ্রেণির একাংশ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এ রকম একটি অস্থির-বৈনাশিক সময়ের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে ছন্দপতন ঘটে, মানুষ তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে যেন 'পাগলে' পরিণত হয়। আলোচ্য গল্পে আব্বাস সেই অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত মানুষের প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধের দুই বছর আগে যার মাথায় গোলমাল দেখা দেয় এবং যুদ্ধ থেকে ফেরার পর স্বাধীন দেশে সে পুরো পাগল হয়ে যায়। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে সেবা-শুশ্রূষার অভাবে সে পাগল হয়। আব্বাস সম্পর্কে লেখকের এই বক্তব্য প্রতীকী। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের আগে যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়, মুক্তিযুদ্ধের পরও সেই অরাজকতার পুনরায় আবির্ভাবে আব্বাসের মতো নিরীহ স্কুলমাস্টার মানসিক ভারসাম্য হারায়। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেও সেই অরাজকতার নিশানা মুছে ফেলতে পারেনি আব্বাস। তার অবচেতন মনে গেঁথে থাকে যুদ্ধকালীন সংকট ও সংগ্রামের কথা। একইসঙ্গে তার প্রলাপের মধ্যে গল্পকার এমনভাবে সেই সংকট ও সংগ্রামকে গেঁথে দেন যে, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। আব্বাস পাগলার অসংলগ্ন প্রলাপের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের দুরবস্থা এবং একইসঙ্গে কীভাবে এ দেশ বেদখল হয়ে যাচ্ছে তার রূপকল্প লেখক নির্মাণ করেন চাঁদের প্রতীকে:

১. নদীর আবার নাম কিয়ের? এই চুতমারানিরা গেছে, খানকির বাচ্চাগুলি অহন নাম দিবো। নাম দিবো, দাগ দিবো, খতিয়ান করবো, কবলা করবো, দলিল করবো, মিউটেশন করবো—হালারা বাপদাদাগো সম্পত্তি পাইছে তো, বুঝলি না? নদীর দোনো পাড়ে পজিশন লইয়া রেডি হইয়া আছে। দুনিয়ার পানি বাতাস মাটি আগুন পাথর তো জাউরাগুলি পচাইয়া দিছে, অহন পচাইবো চান্দেরে!' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১৭৪)

২. কুত্তার বাচ্চাগুলি চান্দের গ্রাভিটেশন বাড়াইয়া দিতাছে। এতোগুলি মানুষ গেছে, এতোগুলি আর্মস লইয়া গেছে, গ্রাভিটেশন বাড়াবো না? অহন কী হইবো? (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১৭৪)

৩. আঙুলের কড়ে ১৯৬৯ থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত গুণে সে বলে, চাইরটা বছর ভি পুরা হয় নাই, অকুপেশন আর্মি গিয়া চান্দের বহুত এরিয়া ক্যাপচার কইরা রাখছে, বুঝলি? (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১৭৫)

এখানে আব্বাসের অসংলগ্ন কথার অর্থ বুঝতে সমস্যা হয় না পাঠকের। সমগ্র গল্প জুড়ে এই চান্দ বা চাঁদের প্রসঙ্গ বহুবার লক্ষ করা যায়। চাঁদ এখানে স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মুক্তিযুদ্ধের পরেও চাঁদ বা বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়নি। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসকে উপজীব্য করে স্বাধীন বাংলাদেশে একশ্রেণির মানুষের অবৈধ উত্থান গড়ে ওঠে। এই শ্রেণিকে হটাতে আব্বাস পাগলা রানার কাছে বারবার একটি স্টেনগান চায়। একটা স্টেনগান পেলে সকলকে সে 'পানির লাহান' ফেলে দিতে পারে। 'তার মাথার ভেতর যে নতুন যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তাতে সে একসময়ের যোদ্ধা রানাদের শত্রু হিসেবে শনাক্ত করেছে

সংগত কারণে। এই প্রতীকী চরিত্র শনাক্তকরণের মাধ্যমে লেখক স্বাধীনতা-উত্তরকালের প্রকৃত শত্রুদের চিহ্নিত করেছেন' (জাফর ২০১২: ৭২)। এই চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধীচেতনা লেখকের বি-উপনিবেশায়ন ভাবনার দ্যোতক। স্বাধীন বাংলাদেশে রানা অস্ত্রকে পুঁজি করে ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে। তার ঘরে নিত্যনতুন টেলিভিশন, ফ্রিজ আসে। ফোক্সওয়াগন গাড়িতে চড়ে। 'আই.বির যারা বাপ, তাদের বাপের সঙ্গে রানার কড়া লাইন। দামি দামি জিনিসপত্রে ঘরবাড়ি ভরে তুললো, গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগে না' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১৭৩)। মুক্তিযুদ্ধকালে যে চেতনা নিয়ে রানা যুদ্ধ করে, সেই চেতনা স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। সেই চেতনার অপপ্রয়োগ দূর করতে চেয়েছেন গল্পকার আব্বাস ও মিলির মাধ্যমে। কিন্তু সুবিধাবাদী মানসিকতার দরুন আব্বাস পাগলার মতো একজন মুক্তিযোদ্ধাও সেই চেতনা ধরে রাখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেও পরিবর্তিত হয়। পিজি হাসপাতাপালে কিছুদিন ভর্তি থেকে মনোচিকিৎসকের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে সে রানাদের দলে ভিড়ে যায়। মিলিকে সে বলে 'রানারে একটু বুঝাইয়া কইয়ো। রানার কয় বন্ধু একটা ইন্ডেটিং ফার্ম করছে। রানা ইচ্ছা করলে আমারে প্রভাইড করতে পারে' (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১৮২)। একজন মুক্তিযোদ্ধার মানসিকতার পরিবর্তন হলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কখনো বিনাশ হয় না। আর হয় না বলেই যুদ্ধের পরের বাকি কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নিয়ে মিলি স্টেনগান নিজের হাতে তুলে নেয়। লেখকের বর্ণনায়:

> আকাশের দিকে মুখ তুললে মিলি টের পায় যে চারদিকের বাতাস চাপা হয়ে আসছে। চাঁদ তাহলে এতক্ষণে শত্রুর কব্জায় চলে গেছে! ... হাতের স্টেনগানের ইস্পাতে আঙুল বুলাতে বুলাতে পায়ের পাতায় চাপ দিয়ে মিলি আরো ওপরে দেখার চেষ্টা করে। ... চাঁদের রেঞ্জ এখনো মেলা দূর, ওকে তাই দাঁড়াতে হয় পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে। এতে হচ্ছে না। এবার একটা উড়াল দেওয়ার জন্য মিলি পা ঝাপ্টায়। (আখতারুজ্জামান ২০০৭: ১৮৩)

যুদ্ধের সময় যে অস্ত্র সমষ্টির স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যুদ্ধের পর সেই অস্ত্র ব্যক্তির স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। এই অস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক। যুদ্ধোত্তর বাস্তবতায় সাধারণ মানুষ সেই অস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন পায়নি। অস্ত্রকে পুঁজি করে কেবল ক্ষমতাধর শ্রেণি। এই শ্রেণি-শত্রুদের খতম করে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করতে মিলির হাতে অস্ত্র তুলে দেন গল্পকার।

মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বাসী ইলিয়াসের কাছে সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষ্য মানুষকে বিপ্লবের মন্ত্রে উজ্জীবিত করা, সংগ্রামী ধারার পক্ষে চিন্তাকে চালিত করা। এরই ধারাবাহিকতায় গল্প রচনার ক্ষেত্রেও ইলিয়াসের প্রথম লক্ষ্যই থাকে সমাজবাদীচেতনার প্রকাশ ঘটানো। প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার ভেতর পুঁজিবাদী শ্রেণির আচরণ ও সমাজের অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে তিনি শোষিত শ্রেণির পক্ষে গল্প রচনা করেন। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে অধঃপতিত নারীদের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বয়ান তুলে ধরেন। পাশাপাশি বাঙালি জাতীয় চৈতন্যের জাগরণের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ তাঁর গল্পে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইলিয়াসের এই বিপ্লবী চেতনা ও প্রয়াস শ্রেণিগত-সাংস্কৃতিক দাসত্ববৃত্তির বিরুদ্ধে বিকল্প রাজনৈতিক চেতনার সূচনা করে।

সহায়কপঞ্জি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (২০০৭)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র* ১। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

এজাজ ইউসুফী (২০১৬)। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বিশেষ সংখ্যা, *লিরিক*। চট্টগ্রাম: বাতিঘর

জাফর আহমদ রাশেদ (২০১২)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প*। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১)। *উপন্যাস: রাজনৈতিক*। কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০১৮)। 'ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত)। কলকাতা: আনন্দ

মাসুদুল হক (১৯৯৮)। 'নির্মোহ বাস্তবতার চালচিত্র', আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, *তৃণমূল* ৪র্থ সংখ্যা (আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত)। ঢাকা

রণেশ দাশগুপ্ত (২০১৪)। *রণেশ দাশগুপ্ত রচনাসমগ্র* ২ (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

শান্তনু কায়সার (১৯৯৮)। 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ', আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, *তৃণমূল* ৪র্থ সংখ্যা (আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত)। ঢাকা

সিরাজ সালেকীন (২০১০)। *ভারতীয় শাস্ত্রে নারীকথা*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ

হুমায়ুন আজাদ (২০১২)। *দ্বিতীয় লিঙ্গ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

Beauvoir, Simone de (2011). *The Second Sex* (Translated by Constance Borde and Sheila, Malovany Chevallier). London: Vintage BOOKS

Fanon, Frantz (1990). *The Wretched Of The Earth* (Translated by Constance Farrington). London: Penguin Books

FOUCAULT, MICHEL (1998). *The Will To Knowledge: The History Of Sexuality* 1. (Translated by Robert Hurley). England: Penguin Books

Millett, Kate (1970), *Sexual Politics.* Chicago: University Of Illinois Press